Vol. 52 | No. 3 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উপনিবেশিত মানবের হৃত-শৈশব : মাহমুদুল হকের উপন্যাস

Volume	52
Issue	3
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Kanij Fatema
Published online	June 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i3.10
Pages	203-216
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

উপনিবেশিত মানবের হৃত-শৈশব : মাহমুদুল হকের উপন্যাস

Check for updates

কানিজ ফাতেমা*

স্বল্প ব্যাপ্তির মানব-শৈশব যখন তার আটপৌরে অর্থের খোলস পাল্টে নিয়ে জীবনের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে তখন 'শৈশব' শব্দবন্ধটি প্রতীকের মর্যাদা লাভ করে। ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হকের জীবন-ভাবনাতেও 'শৈশব' বিশেষ তাৎপর্যে প্রতীকায়িত; তাঁর কাছে 'জীবন মানেই শৈশব; জীবন ভর মানুষ এই একটা ঐশ্বর্যই ভাঙিয়ে খায়, আর কোনো পুঁজি পাট্টা নেই তার' (মাহমুদুল, ২০১২ : ৯৩)। মাহমুদুল হকের স্বল্পবিস্তৃত উপন্যাস-বিশ্বের প্রায় পুরোটা জুড়েই উপনিবেশের ঘা-খাওয়া মামুলি একদল মানুষের শৈশব হারানোর কাতরতা প্রকট হয়ে উঠেছে। উপমহাদেশের বারবার পাল্টে যাওয়া রাষ্ট্রীয় ভূগোল আর তাতে বেখাপ্পাভাবে বেড়ে-ওঠা মধ্যবিত্তের জীবনাভিজ্ঞতা, যা নব্য-উপনিবেশিত চক্রান্তে ক্রমশ আবিল হয়ে উঠেছে — তা-ই মূলত মাহমুদুলকে শিখিয়েছে কীভাবে উত্তর-উপনিবেশিত দৃষ্টি দিয়ে জীবনের সমার্থক হয়ে-ওঠা এই শৈশবের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। শৈশবের সারল্যের আশ্রয় থেকে 'বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন যে মানুষ বিরূপ বাস্তবের জটিলতায় আক্রান্ত, তারই কাতরোক্তি বারবার শোনা যায় মাহমুদুল হকের উপন্যাসে' (অরুণ, ২০১০ : ৫৮)। শৈশব-ই যদি মাহমুদুলের কাছে জীবন-সর্বস্ব রূপে প্রতীয়মান হয় তবে কি শৈশব হারানো জীবন মৃত্যুর নামান্তর? অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত এরূপ জীবন তাঁর উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি উপন্যাসেই ফিরে ফিরে এসেছে। আর প্রতি ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিকের বীক্ষণ-উপায় রূপে উত্তর-উপনিবেশবাদী বীক্ষা মুখ্য বিবেচিত হয়েছে — যার কেন্দ্রে আছে 'শৈশব' প্রতীক। উল্লিখিত এই প্রতীকের পাঠ বিশ্লেষণ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, মাহমুদুল হকের উপন্যাসে বিপন্ন অস্তিত্বের মানুষেরা বর্তমানের জটিল বাস্তবতায় আশ্রয় খোঁজে শৈশবস্মৃতির। এই শৈশব হারানোর বেদনা তাদের আছে, আবার ফিরে পাওয়ার আকুতিও তাদের ভেতর সমানভাবে বিদ্যমান। এই টানাপড়েনে তারা ক্লান্ত হয়, জর্জরিত হয় প্রতিকারহীন হাহাকারে। সমাজের এই মাঝারি মানুষগুলো ঔপন্যাসিকের প্রিয়জন; এদের সঙ্গে তিনি অনুভব করেন বিশেষ ধরনের আন্তর-নৈকট্য। উপনিবেশের শিকল ভেঙে বেরিয়ে-আসা এই মানুষগুলোর অনুভবকে উত্তর-উপনিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাহমুদুল হক তাঁর উপন্যাসে আরও বিবিধ শিল্পচিন্তাকে যুক্ত করেছেন। তাই তাঁর এই ঘরানার উপন্যাসগুলোতে তিনি অস্তিত্ববাদী কাঠামোর বিকাশ ঘটান, কখনো আবার ন্যারেটিভে জাদুবাস্তব কাঠামো প্রয়োগ করেন; এমনকি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব তাঁর শিল্প-উপায় রূপে গৃহীত হয়। তবে এতসব শিল্প-কৌশল চূড়ান্তভাবে সমন্বিত হয় উত্তর-উপনিবেশবাদী সাহিত্য বিশ্লেষণ কাঠামোকে অবলম্বন করেই।

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাহমুদুল হক ১৯৪১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের অভিজ্ঞতায় দগ্ধ শৈশব নিয়ে ১৯৫০ সালে স্থায়ীভাবে তিনি পূর্ববাংলায় চলে আসেন। মাহমুদুল হকের বেড়ে-ওঠার ক্রমধারার সমান্তরালে এদেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছিল, দেশভাগ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক জীবনে যে স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, অবসাদ-ক্লান্তি-হতাশা-নৈরাজ্য-বিষাদ এনেছিল, তাকেই তিনি তাঁর *অনুর পাঠশালা* (১৯৭৩), *জীবন আমার বোন* (১৯৭৬), *খেলাঘর* (১৯৭৮), *কালো বরফ* (১৯৯২), *অশরীরী* (২০০৪), *পাতালপুরী* (২০০৯) প্রভৃতি উপন্যাসে নানামাত্রায় তুলে ধরেছেন। তবে তাঁর কোনো উপন্যাসেই প্রত্যক্ষ রাজনীতি বা রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি প্রধান হয়ে ওঠেনি; বরং রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সমাজের ভাঙন, ব্যক্তির সংকট ও অসংগতিকে তিনি শিল্পিতভাবে তুলে ধরতে সচেষ্ট থেকেছেন। কেননা রাজনৈতিক ঘটনা ব্যক্তি-হৃদয়ে কী প্রভাব ফেলেছে তার বিশ্লেষণেই তিনি অধিক মনোযোগী ছিলেন। অর্থাৎ বলা যায়, বহির্বাস্তবতার চাপে অন্তর্বাস্তবতাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী ছিলেন মাহমুদুল হক। তাঁর চৈতন্য জুড়ে সবসময় দগদগে হয়ে থেকেছে দেশভাগের ক্ষত।

প্রসঙ্গত স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, দেশভাগের সূত্রে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের নব্য-উপনিবেশে পরিণত করার পথ সুগম হয়। আর এর মধ্য দিয়ে শিক্ষা-স্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলাকে পরিকল্পিতভাবে পশ্চাৎপদরূপে রাখার দুরভিসন্ধি আঁটে রাষ্ট্রযন্ত্র। এদেশের সাধারণ মানুষগুলো এক উপনিবেশ থেকে আরেক উপনিবেশের চোরাবালিতে নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু 'দেশভাগের সত্য বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা স্থানগত, আর হৃদয় ও মননের যে-দেশ, তা কখনো ভাগ হয় না, ভাগ হতে পারে না' (সুতপা, ২০০৩ : ৫৮-৫৯)। এই দেশভাগের ফলে সৃষ্ট সমস্যা যেমন, মাতৃভূমি ত্যাগের মর্মন্তুদ যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক ধস, সর্বত্র পিছিয়ে পড়া প্রভৃতি বিষয় মাহমুদুল হক তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর মানসে এসব পরিস্থিতি তীব্রভাবে ছিল ক্রিয়াশীল। এমনকি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এক অদৃশ্য উপনিবেশবাদী জুজু ভর করে থাকে এই দেশের ওপর। 'বিশ্বায়ন' সুভাষণে অভিহিত এক ধরনের নব্য উপনিবেশবাদকেই মাহমুদুল আমৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং বিশ্বায়নের খোলসে মোড়ানো একটি বহুরূপী উপনিবেশিত সমাজব্যবস্থায় মাহমুদুল হকের শিল্পী জীবনের বিকাশ ও পরিণতি। কিন্তু চৈতন্যের দিক থেকে সদর্থক উত্তর-উপনিবেশবাদী ভাবনাকে তিনি লালন করেছেন যা তাঁর লেখায় শৈশব জীবনের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় — যেখানে সমাজের সঙ্গে মানব মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্ব শিল্পঘন রূপ লাভ করেছে। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান আলোচনায় 'শৈশব' প্রতীকের চারটি উল্লেখযোগ্য চিহ্নায়িত তাৎপর্যকে শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো : অমীমাংসিত আত্মপরিচয়; সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ– ঘরে ও বাইরে; বিলীন শৈশব : শ্রেণি-সংঘাতময় জীবন এবং শৈশব-ভাবনার আদিপাঠ : *অনুর পাঠশালা*। লক্ষণীয় যে, প্রতীকটির চিহ্নগত বিশেষত্বকে প্রাধান্য দেওয়ায় এবং নব্য স্মৃতির ব্যাকরণ-ভাঙা উল্লম্ফনধর্মিতার কারণে উপন্যাসগুলোর প্রকাশক্রম অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। তাই *অনুর পাঠশালা* মাহমুদুল হকের প্রথম উপন্যাস হওয়া

সত্ত্বেও বর্তমান প্রবন্ধে এই উপন্যাসের আলোচনা প্রথমে স্থান পায় নি। এই সম্পর্কিত কৈফিয়তটি এখানে দেওয়া যেতে পারে। শৈশব ভাবনা যে মাহমুদুল হকের উপন্যাসে একটি প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠবে কেবল *অনুর পাঠশালা* পড়ে সেটি বুঝে নেওয়া সহজ নয়। *কালো বরফ* উপন্যাসের আখ্যানে হারানো শৈশবের বেদনা যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তা-ই সচেতন পাঠককে পূর্ববর্তী উপন্যাস সমূহে শৈশব অনুষঙ্গ সমূহ কীভাবে রয়েছে তা অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য শৈশব নিয়ে মাহমুদুল হকের যে নিজস্ব জীবন-দর্শন ক্রমশ বিকশিত হয়েছে তার নিম্নক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই যথাযথ বলে এই প্রবন্ধে বিবেচিত হয়েছে।

অমীমাংসিত আত্মপরিচয়

উত্তর-উপনিবেশবাদী যে দৃষ্টিকোণ মাহমুদুল হকের উপন্যাসে অন্বিষ্ট তার অন্যতম মুখ্য প্রান্ত হলো আরোপিত সকল জীবনভাবনা থেকে বেরিয়ে আসা। এ কারণেই জীবনের অকৃত্রিম সময়পর্ব হিসেবে চিহ্নিত যে শৈশব তা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে মাহমুদুলের বেশ কিছু উপন্যাসে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, শৈশবের ভূমিকা আত্মপরিচয় অর্জনে সহায়ক; উত্তর-উপনিবেশবাদের তাগিদটাও ওখানেই। যার ফলে 'এই ভাবনার কাঠামো কিছু নিরাপদ বিভাজনের, আমরা-ওরা জাতীয় নিশ্চিত দর্শনের অসৎ আত্মশ্লাঘা ও রাজনৈতিক পক্ষাঘাত থেকে নতুন প্রশ্ন ও উত্তর খোঁজার পথে কিছুটা হলেও যেতে উৎসাহিত করে' (রংগন, ২০১৪ : ৪০৫)। শুধু আত্মপরিচয় অর্জনই নয়; ঐতিহ্যসংলগ্ন জ্ঞানচর্চার কথা বলে উত্তর-উপনিবেশবাদ। ঔপনিবেশিক শাসনকালে ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশের মানুষগুলির মনে নিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি হীনম্মন্যতা প্রবেশ করিয়েছিল এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের মনন-চৈতন্য তথা ভাবজগৎ-কে ধ্বংস করেছিল। উত্তর-উপনিবেশবাদ তাই খোঁজ করার চেষ্টা করে 'কীভাবে উপনিবেশকারী অধীনস্থর চিন্তাজগৎকে সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে, কীভাবে তার উন্নত সংস্কৃতির সুফল সম্পর্কে উপনিবেশিত মানুষকে অবহিত করা হয়। অতীত খনন করে তুলে আনে উপনিবেশকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইতিহাস ও গল্প-কাহিনি। ঔপনিবেশিকতাবাদ যেমন বিস্মৃতির (amnesia) প্রচেষ্টায় রত থাকে, উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ তেমনি স্মরণের (anamenesic) সংস্কৃতি তৈরি করতে চায়' (হিমাদ্রি, ২০০৯ : ৬২৩)। এই চিন্তাভাবনাগুলিই বিভিন্ন সময়ে ফ্রান্ৎজ ফানো (১৯২৫-৬১), আলবেয়ার মেমি (জ. ১৯২০), এইমে সেজায়ার (১৯১৩-২০০৮), এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ (১৯৩৫-২০০৩), গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক (জ. ১৯৪২) প্রমুখের লেখালেখির মধ্য দিয়ে প্রসার লাভ করেছে। একইসঙ্গে, উত্তর-উপনিবেশবাদের নঞর্থক দিকও রয়েছে। এই তত্ত্বের কঠোর সমালোচকদের মতে, উত্তর-উপনিবেশবাদ 'এক ধরনের রাজনৈতিক সুবিধাবাদের ফসল। এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির নামে আসলে উপনিবেশের ওপর ভিত্তি করে উন্নত ও উন্নতশীল দেশগুলির মধ্যে যে শোষণের ইতিহাস চলেছে তাকে লঘু করে দেওয়া হচ্ছে' (রংগন, ২০১৪ : ৪০৩) এবং পরিণামে এটি কলোনিয়াল ভাবনাকেই লালন করছে। কেননা আধিপত্যের বাস্তবতাটি উত্তর ঔপনিবেশিককালেও সমমাত্রায়, সুপরিকল্পিতভাবে বহমান। বিশ্বায়নের নামে নব্য উপনিবেশবাদী কাঠামোতে

অধিকাংশ দেশ গুটিকয় দেশের আধিপত্যের অধীন। ওই গুটিকয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবসায়িক সংগঠন, বহুজাতিক সংস্থা, বিশ্বব্যাংকের মধ্য দিয়ে এখনও চলছে নব্য-উপনিবেশকে টিকিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা। বিশ্বায়নের থাবা এলোমেলো করে দিয়েছে প্রতিটি জাতির নিজস্ব আইডেনটিটিকে। এরকম অগোছালো সময়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে মাহমুদুল হকের উপন্যাসের সাধারণ মানুষেরা। তাঁর উপন্যাসে চরিত্রগুলি উন্মূলিত, বিবিক্ততায় আক্রান্ত, শিকড়হীন, বিচ্যুত। সামাজিক-অর্থনৈতিক মানদণ্ডে সুযোগবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া, প্রভাবশালী শ্রেণি কর্তৃক শোষিত অতি সাধারণবর্গের মানুষকে তিনি চিত্রিত করেন। এই শ্রেণির প্রতিই তাঁর পক্ষপাত স্পষ্ট। সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র রূপায়ণের এই আততির মধ্যে নিহিত রয়েছে মাহমুদুল হকের উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবনার বীজ। বিশেষত তাদের হারানো শৈশব-জীবনের রূপায়ণের মধ্যেই মাহমুদুল হকের সদর্থক উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবনা প্রোথিত থেকেছে। তাঁর উপন্যাসে শৈশব-জীবন উত্থাপিত হয় স্মৃতিযাত্রার সূত্র ধরে; যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মাহমুদুল হকের হারিয়ে যাওয়া শৈশব জীবন প্রতীকায়িত হয়েছে। শৈশব হারিয়ে যাবে এটাই চিরন্তন সত্য। কিন্তু হারানোর বেদনা এত তীব্র কেন? কারণ শৈশব হারানো ওই মানুষটির জন্য যৌবন কোনো রাজটীকা পরানোর জন্য অপেক্ষা করছে না। নব্য-উপনিবেশবাদী কাঠামোয় শৈশব-অতিক্রান্ত জীবন ভরে উঠছে বিষময় অভিজ্ঞতায়। আর তাই বর্তমানের ব্যর্থতা ভারাক্রান্ত জীবন থেকে নিষ্কৃতি পেতে মাহমুদুল হকের চরিত্রগুলো শৈশব অভিমুখে পশ্চাৎগামী হতে চায়। কিন্তু শৈশবকে ফিরে পেতে চাইলেও পাওয়া সম্ভব নয়। সময়ের স্রোতে হারিয়ে যায় শৈশব।

কালো বরফ উপন্যাসের আখ্যানের বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছে আবদুল খালেকের শৈশবস্মৃতি। এক্ষেত্রে উপন্যাসটির গঠন-কৌশল একটি বিশিষ্টমাত্রায় উত্তীর্ণ হয় যেখানে একজন ব্যক্তিমানুষের দুটি সত্তাকে ঔপন্যাসিক তুল্যমূল্যে উপস্থাপন করেন — একটি 'পোকা' সত্তা, অন্যটি আবদুল খালেক সত্তা। উপন্যাসের মূল চরিত্র আবদুল খালেক তার ডায়েরিতে যে শৈশবস্মৃতি অর্থাৎ পোকা সত্তার কাহিনি লিখেছে তা উপন্যাসে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে পোকারূপী আবদুল খালেকের বর্তমান জীবন-যন্ত্রণার কাহিনি। ফলে বর্তমান যন্ত্রণাময় জীবন থেকে আবদুল খালেকের শৈশবযাত্রার সূত্র ধরে লেখক বাস্তবজীবন থেকে সরে বাস্তবাতিরেকে চলে যান। আর তখন তার আশ্রয় হয় জাদুবাস্তব কাঠামোয়। উপন্যাসে পোকাসত্তার কাহিনির মধ্যে রূপকথা, লোকগাথা, মিথ অবলম্বনে উঠে আসে আশ্চর্যসব ঘটনা। প্রসঙ্গত সমালোচকের নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'পোকার শৈশবজগৎ এবং মাছ-পাখির মতো প্রাকৃতিক বিষয় একাকার হয়ে গেছে লৌকিক-অলৌকিক আরো অনেক কিছুর সঙ্গে, তার শিশুসুলভ কল্পনার বাস্তব-অবাস্তব মিশে গেছে, এ এক চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টিক্ষমতা মাহমুদুল হকের। যাদুবাস্তবতার কথিত ধারণার সঙ্গে এর মিল। কিন্তু এ তার চেয়েও বেশি এবং ভিন্ন কিছু' (কাজল, ২০১০ : ১৬৩)।

উপন্যাসে এই বাড়তি ও ভিন্ন কিছুর প্রকাশে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে উপনিবেশকালের মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়; উপনিবেশ সৃষ্ট দেশভাগের পটভূমিতে আব্দুল খালেকের বর্তমান জীবনযন্ত্রণার কাহিনি। যদিও উপন্যাসে পোকার শৈশব জীবন, দস্যি ছেলে মনি

ভাইজান, পুঁটি, পাচু, ঝুমি, মিত্তির বাড়ির মেয়ে ছবিদি, শনপাপড়ি, কুলপি মালাইওয়ালা, চিনাবাদামওয়ালা, কেনারাম কাকা, মা মিলে তার চারপাশের জগৎটাকে আনন্দঘন করে তোলে; পুঁটির মাছ-পাখির সাথে কথা বলা, মনি ভাইজানের কাছ থেকে জাদু-মন্ত্র-তন্ত্র শেখা, শালিক পাখির সাথে কথা বলা, কাগজের নৌকা বানানো, জলে ভাসমান পিঁপড়ের পাশে লাইফ বোট হিসেবে শুকনো পাতা ছেড়ে দেওয়া, বাড়িতে আগত সাধুর মন্ত্র-তন্ত্র জানা সব মিলিয়ে পোকার জীবনটা অদ্ভুত এক মায়ার জগতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। উপন্যাসে এসব ঘটনা থাকলেও পোকারূপী আবদুল খালেকের জীবনকে বাস্তববাদী ন্যারেটিভের ধাঁচে তুলে ধরে লেখক ব্যক্তি-হৃদয়ের মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন অপরিসীম সহানুভূতির সঙ্গে। কেননা দেশভাগের পটভূমিতে ব্যক্তিচিত্তের উন্মোচনই লেখকের অন্বিষ্ট; জন্মভূমি, পোকার শৈশবস্মৃতির জন্য আবদুল খালেকের ভেতরকার যে যন্ত্রণা তার স্বরূপ প্রকাশই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। পোকা সত্তার মধ্য দিয়ে শৈশবস্মৃতির বিলীন হয়ে যাওয়া এবং তার জন্য আবদুল খালেকের নৈসঃঙ্গ্যবোধ, ভেতরের যন্ত্রণার বাস্তব বিবরণ লেখক প্রদান করেছেন এভাবে :

> অযত্ন আর অবহেলায় কত কিছুই যে সে হারিয়ে ফেলেছে! জিনজার এখন গানের মতো বাজে, হিনজার এখন বুকের ভেতর নিরবিচ্ছিন্ন শব্দ তোলে। হু হু বাতাসের গায়ে নকশা-তোলা ফুলের মতো অবিরল আকুলতা, পোকার বুকের ভেতরের ফাঁকা দালানকোঠা গুম গুম করে বাজে, পোকা তুই মর, পোকা তুই মর!
> যা কিছু নিঃশব্দ, যা কিছু শব্দময়, যা কিছু দৃষ্টিগোচর, দৃশ্যাতীত, সবকিছু একজোট হয়ে হাত ধরাধরি করে ঘিরে ধরে; অদ্ভুত এক বাজনার তালে তালে আস্ত একটি রাত মোমের মতো গলে পড়ে, জিনজার-হিনজার জিনজার-গিনজার পোকা শোনে, শুনতে পায়। পোকা পোকা হয়ে যায়। (মাহমুদুল, ২০১০ : ৩৭-৩৮)

উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার মুহূর্তের টানাপড়েন, অর্থনৈতিক ধস, চাকুরির সংকট, দারিদ্র্য প্রভৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে আব্দুল খালেকের জীবনে। উপন্যাসে খালেকের চাকরির সংকট, প্রতিষ্ঠা লাভ না করায় মামুলি মানুষ হয়ে তাকে টিকিয়ে রাখে। উপন্যাসের বর্তমানে সে পূর্ব-পাকিস্তানের এক মফস্বল শহরে আধা প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট কলেজের শিক্ষক যেখানে অনিশ্চিত জীবিকা, মাইনে কম। সংসার জীবনে অভাব-অনটন, আর্থিক-দৈন্য থেকে প্রায়শই খালেক ও রেখার মধ্যে কলহের সূত্রপাত ঘটে। একদিকে খালেকের শিক্ষকতা পেশায় স্বল্পবেতন, অন্যদিকে সংসারের প্রতি তার উদাসীনতার কারণে ক্ষুব্ধ রেখা যখন খালেককে অভিযোগের সুরে কটু ভাষায় কথা বলে তখন সেখানে সময়টা হয়ে যায় নিরানন্দ। যেখানে আনন্দের পরিধি ব্যাপ্ত হওয়ার কথা ছিল সেখানে তা আরো বেশি হয় লক্ষ্যহীন। সুতরাং একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয় আনন্দঘন শৈশবের সাথে বর্তমানের যন্ত্রণাবিদ্ধ জটিল বাস্তবতার। এজন্য উপন্যাসে আবদুল খালেক চরিত্রটিকে সর্বদাই শৈশবস্মৃতির জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতে দেখা যায় —

> তখন তো কিছু বুঝতাম না, একটা শালিক পাখির জন্য কি হাহাকারটাই না ছিলো বুকের ভেতর, একদিন দেখা না পেলে সবকিছুই মিথ্যে হয়ে যেত, একটা ভাঙা কাচের শেকলকে কতো যত্নেই না লুকিয়ে রেখেছি। এখন কাচের সেই শেকল গলায়, না পারি খুলতে, না ফেলতে, খুলতে গেলে যদি গলা কেটে যায়। (মাহমুদুল, ২০১০ : ১২৫)

উপন্যাসের প্রথমে এই চরিত্রটিকে উদাসীন করে লেখক উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সমাপ্তি অংশে অর্থাৎ 'আলো-ছায়ার যুগলবন্দি' শিরোনামাংশে লেখক খালেকের সমস্ত উদাসীনতা ও যন্ত্রণার জট খুলে দেন। দেশভাগের ফলে জন্মভূমি থেকে, নিজের শৈশব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক মর্মন্তুদ যন্ত্রণাময় পরিস্থিতি কুকড়ে খায় আবদুল খালেকের ভেতরটাকে। দেশভাগের সূত্র ধরে জন্মভূমি থেকে উন্মূলিত হয়ে শৈশব অর্থাৎ পোকা সত্তার সাথেও মিলতে পারছে না খালেক; যেখানে ছিল তার মনি ভাইজান, ছবিদি, মা, গিরিবালা, মাধুরী, কেনারাম কাকা প্রমুখ। এই মিলতে না পারার দরুন তার ভেতরকার যে যন্ত্রণা তাকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করে স্ত্রী রেখার আলিঙ্গন। কিন্তু জন্মভূমি ও শৈশবস্মৃতির প্রতিস্থাপন হয় না কোনোভাবেই। তবু বর্তমানের এই যন্ত্রণাকাতর পরিস্থিতিতে শৈশবস্মৃতিই তাকে বাঁচিয়ে রাখে —

> বুকের ওপর দু'টো হাত জড়ো করে মার-খাওয়া মানুষ, যখন বলে মুঠোয় কি আছে দেখতে চেয়ো না, দোহাই তোমাদের কোন কাজে লাগবে না, সারা জীবনের সঞ্চয় শুধু এইটুকুই, এই সামান্য স্বপ্নটুকুই, তখন ধরে নিতে হয় সে বেঁচে আছে কেবল স্মৃতির ভেতর। তার চেয়ে নির্বিষ, তার চেয়ে নিরাপদ জানোয়ার আর কে! (মাহমুদুল, ২০১০ : ১১১)

মানুষের বেঁচে থাকার আর কোনো অবলম্বনই যখন অবশিষ্ট থাকে না তখন মানুষ স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। পোকা জীবন থেকে যখন সেই 'চার ভাঁজ-করা ছবি, তেশিরা কাচ, লালকুঁচ' হারিয়ে ফেলেছে তখন স্মৃতিতেই সেসবের সন্ধান মেলে; স্মৃতিতে ভেসে-আসা সেই মাছ-পাখির প্রাকৃতিক পরিবেশেই খালেক প্রাণ ফিরে পায়। তাই উপন্যাসের শেষদিকে চিত্রিত এমন একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে এসে খালেককে অনেক বেশি উন্মোচিত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ এমন জীবনই তার কাম্য। নদী-বন-গাছপালা-পাখি সংবলিত একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে গিয়েই খালেক রেখার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়, ভেতরের অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রকাশ করে; নদীর ধারে একটা ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে তাদের প্রেমময় শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এটা সম্ভব হয়েছে প্রকৃতির সাথে শৈশবে পোকার মাছ-পাখির যে প্রাকৃতিক পরিবেশ তার পরিবেশিত সাদৃশ্যের শুশ্রূষায়। শুধু শৈশবের প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, সেই প্রতিবেশে হারিয়ে যাওয়া মুখ গিরিবালা, মাধুরীকেও সে সন্ধান করে চলে স্ত্রী রেখার মধ্যে।

সুতরাং আবদুল খালেক নিছক কোনো স্মৃতিবিলাসে আক্রান্ত সত্তা নয়। দেশভাগের পটভূমিতে সমাজ-সংসার ছেড়ে বিবিক্ততায় আক্রান্ত আবদুল খালেক ভেতরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য হাতড়ে বেড়ায় শৈশবের দিনগুলিকে। বর্তমান ব্যর্থ জীবনের অজস্র যন্ত্রণাময় বাস্তব কাঠামোকে অতিক্রম করতে চায় খালেক। আর এক্ষেত্রে শৈশবে প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছার মধ্য দিয়ে জাদুময়তায় চলে যান লেখক, বর্তমানের বাস্তব জীবনের ব্যর্থ দিনগুলিকে আড়াল করতে তিনি খালেককে পোকার জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। কারণ পোকা জীবন তাঁর কাছে অনেক বেশি আনন্দময়। এই নামের মধ্য দিয়ে খালেক উপলব্ধির জায়গায় পৌঁছে যায়, বাস্তবাতিরেকে চলে যায়। খালেকের মনস্তত্ত্বের মধ্যে পোকাই তখন অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, পোকা কোনো স্বাভাবিক

বাল্য-নাম নয়। পোকা নাম পাঠককে অন্য একটি ভাবনার মধ্যে ফেলে দেয়। কেন এমন একটি নাম লেখককে বেছে নিতে হলো? পোকা নামেরই-বা তাৎপর্য কোথায়? পোকা তো অবপ্রাণী, ক্ষুদ্র প্রায়শ অমেরুদণ্ডী কীট। কিন্তু পোকার বাবার বন্ধু কেনারাম কাকার দেওয়া এই নামটি নিয়ে লেখক খুব বেশি ব্যাখ্যার তাগিদ অনুভব না করে একটি বাক্যেই বলে দেন 'কেনারাম কাকাই জানেন আমার নাম পোকা দিয়েছিলেন কেন?' এর মধ্য দিয়ে হয়ত লেখকের বক্তব্য শেষ হয়ে যায় কিন্তু পাঠকের ভাবনা জেগে থাকে। হয়ত ওইভাবে জাগিয়ে রাখাই লেখকের উদ্দেশ্য। উপন্যাসে পোকার নামকরণের আপাত রহস্য ও বিস্ময় স্মরণ করিয়ে দেয় ফ্রানৎস কাফকার Metamorphosis-এর কথা। এ আখ্যানে স্বপ্নের ঘোর লাগা নয়; বরং স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠা একটি চরিত্রের আধিভৌতিক সময়কে নির্মাণ করেছেন লেখক। এক সকালে অস্বস্তিকর স্বপ্ন থেকে জেগে গ্রেগর সামসা দেখে সে এক দৈত্যাকার পোকায় পরিণত হয়ে আছে। কিন্তু তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি একজন মানুষের অর্থাৎ গ্রেগর সামসার। যে ছিল সংসারে একমাত্র আয়ের উৎস, পোকায় পরিণত হওয়ায় সংসার থেকে তার প্রয়োজনীয়তাও হারিয়ে যায় এবং গল্পের শেষে লেখক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার চূড়ান্ত পরিণতি সৃজন করেন। এই পুরো গল্প জুড়ে যে জাদুবাস্তব আবহ বিদ্যমান তা স্মরণে রেখে ধারণা করা যেতেই পারে যে, কাফকা হয়ত মাহমুদুল হককে নানাভাবেই অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কাফকার গল্পে পোকার জীবনের চরম পরিণতি অঙ্কিত হয়েছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু *কালো বরফ* উপন্যাসে দেশভাগের নির্মম বাস্তবতার কারণে হৃত-শৈশব আবদুল খালেকের পোকাসত্তার চেতন্গত মৃত্যু ঘটে; শৈশবের আনন্দময় দিনগুলি মুছে গিয়ে আবদুল খালেকের জীবন নিজের কাছে হয়ে ওঠে অসহনীয় — যা হয়ত মৃত্যুরও অধিক।

সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ—ঘরে ও বাইরে

কালো বরফ উপন্যাসে যুদ্ধ ছিল — সেই যুদ্ধ অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, শৈশবের সঙ্গে অশৈশবের। মূলত আবদুল খালেকের মনের মধ্যেই ঘটতে দেখা গেছে সমস্ত যুদ্ধের আয়োজন। কিন্তু, *জীবন আমার বোন* উপন্যাসে যুদ্ধটা একেবারেই বাস্তব, সারা দেশ জুড়ে এর বিস্তার আর মন জুড়ে শৈশবের আকুলতা ও যৌবনের দায়িত্ববিমুখতার দ্বৈরথ। এখানেও শৈশব হারিয়ে শৈশবের জন্য পরম ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। একাত্তরের মার্চের বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে *জীবন আমার বোন*-এর আখ্যান। যেখানে দেশজুড়ে চলছে মুক্তিযুদ্ধের আয়োজন, যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি; সেখানে যুদ্ধের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জাহেদুল করিম ওরফে খোকা; সর্বত্রই তাকে মনে হয় বিপন্ন-অবসাদগ্রস্ত। রাজনৈতিক সময়ের অস্থিরতায় মানুষকে অনিশ্চয়তার পথে ধাবিত করে, নিঃসঙ্গ করে তোলে কিন্তু আপাত এই আবরণের আড়ালে রয়েছে খোকার জীবনের ভিন্ন এক বাস্তবতা। উপন্যাস পাঠে জানা যায়, মাতৃহীন পরিবারে ছোট বোন রঞ্জুকে নিয়ে ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় এক দোতালা বাড়িতে থাকে খোকা। দুজনের বয়সের ব্যবধান সাত বছরের — একজনের বাইশ, অন্যজনের পনেরো। খোকা ও রঞ্জুর জন্মের মধ্যবর্তী

সাত বছরের পরিসরে জন্ম হয়েছিল অঞ্জু ও মঞ্জু নামে আরো দুটি বোনের। কিন্তু শৈশবে তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায় অঞ্জু-মঞ্জু। বর্তমানে রঞ্জুর মধ্যে খোকা খুঁজে পায় তাদের হারিয়ে যাওয়া বোন অঞ্জু-মঞ্জুর স্মৃতি —

> বয়স কতো হলো রঞ্জুর? গালে রেজর টানতে টানতে হিসেব করে খোকা, সাত বছরের ছোট রঞ্জু। আরো দুটো বোন ছিল। রঞ্জু আর তার মাঝখানে, একজন অঞ্জু অপরজন মঞ্জু। বাঞ্ছারামপুরে মামা বাড়ির পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটের শ্যাওলায় পা হড়কে পানিতে পড়ে যায় অঞ্জু, মঞ্জু নামে তাকে ধরতে; বাঁচানো যায় নি দু'জনের একজনকেও। রঞ্জু যেন মামাবাড়ির সেই আশ্চর্য শান্ত তিরতিরে পুকুর যার গভীর গোপন তলদেশে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে আছে অঞ্জু আর মঞ্জু। (মাহমুদুল, ২০১২ : ১৩)

জীবন চলার পথে শৈশবের এই স্মৃতিতেই ভারাক্রান্ত হয়েছে খোকা। এজন্য উপন্যাসে খোকা শৈশবানন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক ধরনের অবসাদগ্রস্ততা ও উলম্ফনধর্মিতার মধ্যে জীবনযাপন করে। তার চলাফেরা ও ভাবনা-চিন্তার মধ্যে কোনো সাযুজ্য রক্ষিত হয় না। চলতে ফিরতে হঠাৎ করেই তার ভেতর থেকে উত্থিত হয় প্রশ্ন —

> অঞ্জু আর মঞ্জু হারিয়ে গিয়েছিল কীভাবে? বাথরুমের আয়নার মতো সেই পারদ ওঠা ঝাপসা ছবিটি ঝাড়পোছ করে খোকা; মামাবাড়ির পুকুরের শ্যাওলা ধরা শানে পা হড়কে পানিতে ছিটকে পড়লো অঞ্জু, আর হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল মঞ্জু, তারপর অঞ্জু, মঞ্জু কে টেনে নিয়ে গেল আরো গভীরে, শেষে অঞ্জু আর মঞ্জু, মঞ্জু আর অঞ্জু, অঞ্জু, মঞ্জু অঞ্জু মঞ্জু গলা জড়াজড়ি করে ডুবে মরলো।" (মাহমুদুল, ২০১২ : ৮২)

বোনদের এই মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি খোকা। অঞ্জু-মঞ্জুর অস্বাভাবিক মৃত্যুই 'খোকার অবচেতনায় সক্রিয় থেকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার যাবতীয় চিন্তা ও চলা' (ভীষ্মদেব, ২০১১ : ১৫)। এজন্য খোকা অনেক বেশি নিঃসঙ্গ, উদ্‌ভ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত। বর্তমানের এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে খোকা শৈশব-স্মৃতিতে ফিরে যাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে। শৈশব জীবনই খোকার কাছে আনন্দময় যেখানে ছিল অঞ্জু, মঞ্জু আর রঞ্জু। জীবন থেকে দুই বোনকে হারিয়ে খোকার শৈশব জীবন একেবারে বিলীন হয়ে যায়। বোনদের নিয়েই আনন্দে ছিল খোকা। বোনদের হারিয়েই তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে সুন্দর শৈশব। এরপর একমাত্র বোন রঞ্জুও যখন মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পাক হানাদারদের আক্রমণে প্রাণ হারায় তখন খোকার পুরো সত্তাটাই অস্তিত্বহীনতার অতলে তলিয়ে যায়; খোকার উপলব্ধি হয় —

> দেশ তাহলে একটা পুকুর। অঞ্জু মঞ্জুর মতো এক নিস্তরঙ্গ তলদেশে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গিয়েছে রঞ্জু। এই নির্জন পুকুর পাড়ে একা একা সারাটা জীবন যে সে কি করে কাটাবে খোকা তা ভেবে পায় না... ...(মাহমুদুল, ২০১২ : ১৫৮)

এই জিজ্ঞাসা মূলত মাহমুদুল হকের নিজের। লেখকের মতো 'খোকা এক দুর্যোগে [দেশভাগ] অঞ্জু-মঞ্জুকে হারিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল রঞ্জুকে; আরেক দুর্যোগে [মুক্তিযুদ্ধ] সেই রঞ্জুকেও হারিয়ে এখন সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। দেশরূপ পুকুরে তাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে শৈশবরূপ বোনরূপ জীবনমমতাকে। যে শৈশবের প্রতি, যে বোনের প্রতি, যে জীবনের প্রতি

তার বিশুদ্ধ নির্মল মমতা ও ভালোবাসা তা এখন দেশরূপ পুকুরে নিমজ্জমান।' (সৈয়দ, ২০১৪ : ২১১)

বিলীন শৈশব : শ্রেণি-সংঘাতময় জীবন

অবচেতন-যাত্রার সঙ্গী হয়ে শৈশবে পুনর্গমন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব — এই প্রতীতির শৈল্পিক রূপায়ণের ওপরই নির্ভর করে রচিত হয়েছে *নিরাপদ* তন্দ্রা উপন্যাসটি। পুরনো ঢাকার একটি গ্লাস ফ্যাক্টরির কাছে গড়ে-ওঠা ফকিরচাঁদ সর্দারের বস্তিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের আখ্যান পূর্ণতা লাভ করেছে। এই বস্তিরই একটি চরিত্র ইউরেকা মেশিন প্রেসের ম্যানেজার কেরামত আলীর সাথে খুব ছোটবেলা থেকেই তার নিজ গ্রাম জয়পাড়াতে একটি মেয়ে হিরনের সাথে মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার ছিল। যার প্রেমের টানে, নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে জলেশ্বর মাঝির নৌকায় ঘর ছেড়েছে হিরন, সেই প্রেম-স্বপ্ন ভেঙে যায় এক নিমেষে। চুরির দায়ে পুলিশের ভয়ে হিরনকে ফেলে রেখে একাই পালিয়ে যায় কেরামত আলী। এরই সূত্র ধরে হিরনের ব্যক্তিগত জীবনের এক-একটি অধ্যায় উন্মোচিত হতে থাকে, লোলুপ পুরুষের নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে সে। হিরনের জীবনে পুরুষ-পশুদের যে সহিংসতা তার সঙ্গে মিল রয়েছে ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্বের। ঔপনিবেশিকতাই উপনিবেশিতদের নৃশংস করে তোলে ও অধঃপতিত করে — এমনকি নব্য উপনিবেশের কালও এ থেকে মুক্ত নয়, যার দরুন জীবনে ভয়ংকর পরিণতির শিকার হয় হিরনের মতো নিম্নবর্গীয় নারীরা। যুগ যুগ ধরে পুরুষের আধিপত্যময় সমাজে নারী নিম্নবর্গ বলেই প্রতিভাত হয়। কেননা 'কেবল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নয়, শ্রেণি বিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও সাবলর্টান' (পার্থ, ২০১২ : ৩) শ্রেণির কথা বলেছেন গ্রামশি। এই বিন্যাসকে গ্রামশি মূলত দেখেছেন সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে। এখানে এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী ডমিন্যান্ট শ্রেণি, অপর মেরুতে এই শ্রেণির অধীন সাবলর্টান শ্রেণি তথা নিম্নবর্গের মানুষেরা। এই দৃষ্টিকোণে নারীও নিম্নবর্গ। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না নিম্নবর্গীয় নারীরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পুরুষপ্রধান সমাজের শোষণের এই করাল-গ্রাস তাদের মুষ্টিবন্দি করে রাখে। বিষয়টিকে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে দেখার সুযোগও বিদ্যমান। এতে করে বোঝা যাবে, কোন জটিল সমাজতত্ত্ব হিরনকে স্বপ্নবিভোর হয়ে শৈশবে প্রত্যাবর্তিত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে, '...উৎপাদন শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান আর তার প্রতিফলন ঘটে শ্রেণি-সংগ্রামে যার পরিণতিতে ঘটে বিপ্লব ও নতুন সমাজের অভ্যুদয় (হায়দার, ২০১৪ : ৩৬৪)। সুতরাং মার্কসবাদ পাশ্চাত্যের পুঁজি বিকাশের পথে একটা বড় বাধা। অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজ-কাঠামোতে শ্রমজীবী মানুষের জন্য গবাক্ষ উন্মোচনের মতো কাজ করে সাবলটার্নিজম। সাবলটার্ন মতের প্রবক্তারা সর্বহারা শ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করেন। বলা যেতে পারে শ্রমজীবী শ্রেণির সচেতনতার ব্যাপারে এই মতাদর্শের তাত্ত্বিকরা উদাসীন। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণি সচেতন হতে পারলেই পুঁজিবাদী শক্তির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই পুঁজিবাদী কাঠামো খুব

তাৎপর্যপূর্ণভাবে মার্কসিজমকে দূরে রাখতে চেয়েছে। এর পরিবর্তে, পুঁজিবাদ দেখেছে যে সাবলর্টানিজম দরিদ্রের সান্ত্বনা পাওয়ার একটি জায়গা হতে পারে। বস্তুত, পুঁজিবাদী সমাজ-কাঠামোকে চূড়ান্তরূপে ভেঙে ফেলতে চায় না বলেই ইউরোপীয় পুঁজি একরকম নিমরাজি হয়ে মেনে নেয় সাবলটার্ন-ভাবনাকে; আর শ্রমজীবী মানুষের জন্য এই সুযোগে একটু শ্বাস নেওয়ার অবকাশ করে দেয় সাবলর্টানিজম। এই উপমহাদেশীয় নব্য-উপনিবেশ কাঠামোতেও প্রায় অনুরূপ ঘটনাই ঘটে চলেছে। উত্তর-উপনিবেশবাদ যেহেতু উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর কথা বলে, সেহেতু সেখানে সাবলর্টান বা নিম্নবর্গের প্রসঙ্গ এমনিতেই চলে আসে। তবে বাংলা অঞ্চলে মার্কসবাদ পুষ্ট হতে না পারায় উত্তর-উপনিবেশ কাঠামোয় পীড়িত মানুষদের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহানুভূতি দেখানোর সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে সাবলটার্ন-ভাবনা। বিশেষ করে যেহেতু নিম্নবর্গের ইতিহাস উপনিবেশ বিলুপ্ত হওয়ার পরে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে তাই এটাকে বিবেচনা করা হয় উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব হিসেবে। ফলে, ক্ষমতাহীনদের জন্য উপনিবেশ-পরবর্তী সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি কোনো প্রতিকার কিংবা কোনো সমাধান প্রদান করতে পারেনি। আর এই যখন বাস্তবতা, তখন বিভগ্ন মানবাত্মার চেতনা-আশ্রয়ী হয়ে স্বপ্নজগতের অধিবাসী হওয়া ছাড়া আর তেমন কোনো বিকল্প থাকে না। এর মধ্য দিয়েই মানুষ তখন শুদ্ধতার অভিসারী হয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাই লক্ষ করা যায় হিরনের মধ্যে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, অস্তিত্বচেতনার প্রাবল্যেই মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ধারণা জন্মে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে অস্তিত্ববাদী দর্শন বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী সার্তে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সার্তে বিচ্ছিন্নতাকে সত্য জেনেও তার উত্তরণে অর্থাৎ মানবতাবাদী ইতিবাচক সমাধানে বিশ্বাসী। *নিরাপদ তন্দ্রা* উপন্যাসে মাহমুদুল হক উত্তর-ঔপনিবেশিক কাঠামোতে নিম্নবর্গীয় নারী হিরনের অস্তিত্ব সংকট ও তার বিচ্ছিন্নতার সমস্যা উত্থাপন করেছেন। অবশ্য বিচ্ছিন্নতা ও ক্লান্তি থেকে মুক্তির এষণাও তিনি উপন্যাসে দেখিয়েছেন হিরনের শৈশব জীবনে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে।

পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও যখন হিরনের আশ্রয় মেলেনি, তখন সে বিচ্ছিন্নতার বোধে ভারাক্রান্ত হয়। একটা পর্যায়ে ফকিরচাঁদ বস্তিতে গল্পকথক কামরান রসুলের কাছে এসে সে 'নিরাপদ তন্দ্রা'য় অবচেতনলোকে পৌঁছে যায় যেখানে হিরনের অস্তিত্ব আশ্রয় খোঁজে শৈশব-স্মৃতিতে —

> কালো নিস্তব্ধতা সাপের মতো ব্যাঙগেলা করছে কখন সবকিছু, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার সবকিছুর ওপর সেই সাপের হিমশীতল শরীর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে; ক্রমাগত কথা বলে চলেছে, সে যেন একটা ঘাসের গরিব নৌকো ভাসছে নির্জন নদীর বুকে, এমনভাবে ভাসছে যেন তার কোনো শুরু নেই, শেষ নেই, কিংবা শেষ থেকে শুরু — (মাহমুদুল, ২০১০ : ১২৩)।

এখানে চিত্রকল্পাত্মক বর্ণনার মধ্য দিয়ে হিরনের মনের অবদমন প্রতীকায়িত হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের দু'টি ধর্ম — আনন্দধর্ম এবং বাস্তবধর্ম। মানুষ 'আনন্দধর্ম' দ্বারা

তার কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তিকে বোঝায়। অন্যদিকে 'বাস্তবধর্ম' তার বাস্তববুদ্ধির ফসল– সে জানে তার সকল কামনা-বাসনা পূর্ণ হবার নয়, বিবিধ কারণে। তার মধ্যে রয়েছে সামাজিক বিধি-নিষেধ, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি। আমরা আমাদের আনন্দ উপভোগকে বিশাল মাত্রায় জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয়ে যাই; অন্তত পিছিয়ে দিতে বাধ্য হই। এর নাম অবদমন বা repression. (খোন্দকার, ২০১৪ : ১১৫)। আর ইয়ুং মানব মনের যে তিনটি স্তরের কথা বলেছেন — চেতন, অবচেতন ও নির্জ্ঞান মন, সেখানে মানুষের অপূর্ণ বা অবদমিত কামনা-বাসনা জমা হয় অবচেতন (unconscious) স্তরে। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে 'অবচেতন'-এর পাশাপাশি আরেকটি কেন্দ্রীয় বিষয় হলো 'স্বপ্ন'। 'অবচেতনে যাওয়ার 'রাজপথ' হলো স্বপ্ন। স্বপ্ন আমাদের ক্ষণিক সুযোগ দেয় অবচেতনের কাজ প্রত্যক্ষ করবার। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন হলো মূলত অবচেতন ইচ্ছার প্রতীকী পূরণ' (খোন্দকার, ২০১৪ : ১১৭)। *নিরাপদ তন্দ্রা* উপন্যাসে হিরন চারপাশের জটিল কুটিল, বিকারগ্রস্ত বাস্তবের শিকার হয়ে এক অনিঃশেষ অপূর্ণতায় নিপতিত হয়। হিরন চেয়েছিল জীবনের আলো দেখতে। কিন্তু বিপরীতে সে চরম দুর্ভাগ্যের শিকার হয়।। জীবনের আকাঙ্ক্ষাগুলির অবদমন এবং পুরুষদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হতে একপর্যায়ে বিকারগ্রস্ত হিরন স্বপ্নের মধ্যে অনর্গল প্রলাপের সুরে শৈশবের স্মৃতিতে ফিরে যায়, তখন খুব সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হিরনের এই শৈশব স্মৃতিচারণ মূলত তার অবচেতন ইচ্ছার প্রতীকী পূরণ —

> ভাগ্যিস জলেশ্বর ছিল, কতোসব কথা, বুড়োটা না থাকলে ছাই পারতাম নিজেকে সামলাতে, ঠিকই নদীতে ঝাঁপ দিতাম, ক্রোধ লোভের পুত্র, — কি গল্পই না করতে পারে বুড়ো, হিংসা লোভের কন্যা, —সারারাত খৈ ফুটেছিল বুড়োর মুখে, ক্রোধ আপন ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন, —বিবাহ, কি বলে জানো, বলে — জলের ভেতর অভ্যুদয় দেখেছো কখনো, আমি তো রোজই দেখি... ... ... (মাহমুদুল, ২০১০ক : ১২৪)

এখানে হিরনের শৈশব জীবনের যে চিত্রকল্প চিত্রায়িত হয়েছে তা মূলত তার অস্তিত্ববাদী জীবন জিজ্ঞাসার বাস্তব রূপায়ণ। মানুষ ততক্ষণ পর্যন্তই অস্তিত্বশীল যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে পূর্ণ করতে সক্ষম। হিরনের জীবনের পূর্ণতা তার শৈশবস্মৃতির মধ্যে।

শৈশব ভাবনার আদিপাঠ : অনুর পাঠশালা

শৈশবের আনন্দময় সারল্যকে খুঁজে ফেরে *অনুর পাঠশালা* (১৯৬৭) উপন্যাসে অনু। অনুর পাঠশালা মাহমুদুল হকের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৬৭ এবং প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩ সালে। প্রথম প্রকাশকালে যার নাম ছিল 'যেখানে খঞ্জনা পাখি' এবং পরে নামকরণ করা হয় 'অনুর পাঠশালা'। উপন্যাসে অনুর শৈশবের আগাগোড়া পুরোটাই অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। চারপাশে আনন্দ উপভোগের নানা উপকরণ পেয়েও পারিবারিক বিধি-নিষেধের দেয়াল অনুর সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে শৈশব জীবনকে করে তোলে অর্থহীন। এই অবদমন থেকেই অনু বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতায় আক্রান্ত হয়। আর শূন্যতার বোধ থেকেই অনু হয়ে পড়ে মনোবিকারগ্রস্ত।

অনুর পাঠশালা উপন্যাসে অনুর মমতাবিবর্জিত জীবন, অসহনীয় নিঃসঙ্গতা, পারিবারিক বাধা তাকে আনন্দঘন জীবনযাপন থেকে দূরে রেখে শৃঙ্খলিত জীবনে নির্বাসন দেয়। অনুর এই নির্বাসিত জীবনযাপনকে ঔপনিবেশিককালে শৃঙ্খলিত মানুষের প্রতিচ্ছবি হিসেবে ধরা যেতে পারে; যেখানে মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা বেড়েছে, স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা নষ্ট হয়ে গেছে। এমন জীবন পরিসর থেকে বের হয়ে আসতে চায় অনু। সংসারে অনুর বাবা-মা দুজনেই তাদের নিজস্ব জগতে ব্যতিব্যস্ত। তাই অনুও তার মুক্তির পথ খোঁজে; মায়ের কঠোর শাসন থেকে সে পালাতে চায় —

> তোমরা আমাকে আটকে রাখতে পারবে না, ছাদের নিচে আমি হাঁপিয়ে উঠি, একা একা আমি মরে যাই, তোমাদের অনু মরে যায়, অ্যাকোরিয়ামের ভেতরে আমাকে ঠুকরে ঠুকরে খায় জ্যান্ত মাছেরা। (মাহমুদুল, ২০০৯ : ৮৫)

এখানে অনুর বন্দি জীবনের হাহাকার ও আর্তি ফুটে ওঠে। দুপুর এলেই অনেক বেশি নিঃসঙ্গতা অনুভব করে সে । 'দুপুরে অনু একা থাকতে পারে না, ভেবে পায় না কি করবে, কোথায় যাবে' (মাহমুদুল, ২০০৯ : ৯)। তাই নির্বাসিত জীবন থেকে চেতন-অবচেতনে সে চলে যেতে চায় ভিন্ন এক জগতে —

> বাড়ি থেকে পালানো কতো আনন্দের, অনু বারবার রোমাঞ্চিত হয়েছে। বনে-পাহাড়ে, পদ্মার নির্জন কোনো কলাগাছ ঘেরা চরে, জেলেদের ছোটো কোনো গ্রামে — যার চারপাশে কেবল থৈ থৈ পানি — পালালে এইসব জায়গাতেই যাবে। তা না হলে এমন কোথাও যেখানে সকলে চিৎকার করে কথা বলে, ঘাসের বিছানায় ঘুমায়। যেখানে আঠারো কিংবা উনিশটা রাক্ষুসে হাঁ-ও মতো ঘর নেই, বিশাল উঁচু ছাদ নেই, যেখানে বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম, হু হু বাতাস বয়ে যায়। (মাহমুদুল, ২০০৯ : ১৫)

এমন প্রকৃতি-সংশ্লিষ্ট জীবনই অনুর কাছে পরম আনন্দের। আধুনিক যুগ-জটিলতায় যন্ত্রণাকাতর মানুষ যখন প্রকৃতির কাছে আশ্রয় খোঁজে তখন তার মানবিক চৈতন্যের স্ফুরণ ঘটে। উপনিবেশের শৃঙ্খলিত অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকাঠামো থেকে অনুর রোদ-আলো ঝলমল পরিবেশে বেরিয়ে পড়তে চাওয়ার মধ্য দিয়ে মাহমুদুল হক নির্মাণ করেন ঔপনিবেশিক কাঠামোর বিপরীতে গিয়ে ভিন্ন বোধের মানুষ অনুকে। এক পর্যায়ে অনু তার শৃঙ্খলিত জীবন থেকে নিজেকে মুক্ত করে পৌঁছে যায় ঋষিপাড়া বস্তিতে যেখানে ফকিরা, টোকানি, গেনদু, লাটু, ফালানি, মিয়াচাঁন আর সুরদাসীর সাথে অনুর সহমর্মিতার এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এসব ঘটে অনুর অবচেতনলোকে; স্বপ্নের ভেতরে। বাস্তবে অনুর পক্ষে পরিবারের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে ঋষিপাড়ায় পৌছানো সম্ভব নয়, যেখানে রয়েছে সমাজের মূল শেকড় — লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতি। এক্ষেত্রে লেখক ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের আলোকে স্বপ্নের অবতারণা করেন এবং যৌক্তিকভাবে স্বপ্নের সাহায্যে লেখক অনুর অপূর্ণ মনোবাসনাকে পূর্ণ করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু স্বপ্নের সেই আনন্দময় জগৎ থেকে যখন সে চেতন বা বাস্তবলোকে ছিটকে পড়ে তখন এক চরম শূন্যতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়; তখন অনুর মনে হয় —

> উঠোনটা একটা ঘেয়ো জিভ। হা হয়ে জিভ বের করে রেখেছে কুটিল ঋষিপাড়া। মনে হলো বাঁশের খুঁটির গায়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বালতিটা। উঠোনে ওপরের ছায়াময় লালচে আলো অসম্ভব থমথমে, বুঝিবা এক করাল বিভীষিকা! তীক্ষ্ণ বর্শার খোঁচার মতো সহসা মনে হলো অনুর পায়ে পায়ে এক কুটিল ষড়যন্ত্রের মাঝখানে অগোচরে এসে পড়েছে সে; ফণা ধরে আছে এক কালকুটে, ছোবল মারবে, একটু পরেই দাঁতে কাটবে তাকে। (মাহমুদুল, ২০০৯ : ৯০)

শেষ পর্যন্ত অনু শৈশব বিশ্বে একা; তার একাকিত্বময় শৈশবের আর্তিই শোনা যায় — 'চলো এখান থেকে, এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে! এখানে অন্য সুরদাসী, অন্য সুরদাসী' (মাহমুদুল, ২০০৯ : ৯১)। অস্তিত্ববাদীদের মতে, অনস্তিত্ব এবং নিরবধি শূন্যতা নিয়েই অস্তিত্ব। অস্তিত্বকে যদি বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু বলি তবে শূন্যতা তার স্থিতিস্থাপক বা পরিধি। অর্থাৎ অস্তিত্বের চারপাশে শূন্যতা সর্বত্র বিরাজমান। এ শূন্যতা কোনো নঞর্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং সার্তে এ শূন্যতা বলতে অভাববোধকে বুঝিয়েছেন যা ব্যক্তিসত্তার স্বভাব বা প্রকৃতির মূল রূপ। সার্তের মতে, 'ব্যক্তিসত্তারও কোন স্থায়ী রূপ নেই। ব্যক্তিসত্তার মূল স্বভাব বা প্রকৃতি হলো শূন্যতা। আর এ শূন্যতাই হলো অভাববোধ এবং চেতনার ভিত্তি। অচেতন বস্তুর নির্ধারিত রূপ বা প্রকৃতি রয়েছে। কিন্তু চেতন মানুষের এমন কোন রূপ নেই। তার স্বরূপের বা প্রকৃতির মূল রূপই হলো অভাববোধ।' (শরীফ, ১৯৯৭ : ২২) স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে এসে অনু যখন ওই জীবনকে পায় না, তখন যা তার সম্ভাবনা, আর যা তার বাস্তব — এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান অনুভব করে, উদ্বেগ ভর করে তার মনের মধ্যে, আর তখনই সে প্রবল শূন্যতা অনুভব করে; যা হয়ে ওঠে নিদারুণ যন্ত্রণার। কিন্তু এই সংকটটাই বাস্তব। কেননা আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে নিম্নবর্গীয়দের কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বলে কিছু থাকে না। অনুও এখানে আধিপত্যকামী শক্তির অধীন। স্বপ্নময় আনন্দের শৈশবে সে পৌঁছতে চায়। কিন্তু সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে এক নিমিষে তার আনন্দময় শৈশব পরিণত হয় বিষাদে, দেখা দেয় অস্তিত্বের সংকট; আর সংকট থেকে তার মানসিক বিকৃতি ঘটে চরম পর্যায়ে। মনে রাখতে হবে যে, অনুর মধ্য দিয়েই মাহমুদুল হক তাঁর শৈশব ভাবনার আদিরূপকে উপস্থাপন করেছেন। হৃত-শৈশবের যে মনস্তত্ত্ব *কালো বরফ* উপন্যাসে খালেকের মাধ্যমে অত্যুচ্চ শিল্পসাফল্য নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে তার সূচনা অনুকে দিয়েই ঘটেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, মাহমুদুল হক তাঁর উপন্যাসে ঔপনিবেশিক কাঠামোর বিপরীতে অবস্থান নিয়ে শৈশব-স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে উপনিবেশিত মানুষগুলির যথার্থ পরিচয় উদঘাটন করায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। উপন্যাসে চরিত্রগুলি বুর্জোয়া নাগরিক সমাজের পরাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত, কখনো বা নিম্নবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি; বর্তমান যাদেরকে করেছে উদ্বাস্তু, উন্মূল; সত্তার মূল ঠিকানা তারা খুঁজে ফেরে শৈশবস্মৃতিতে। আর এক্ষেত্রে শৈশবকে জাদুবাস্তব আবহে কিংবা ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব ও অস্তিত্ববাদের আলোকে আপাতভাবে ফিরে পাওয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিতে চেয়েছেন লেখক। এর মধ্য দিয়ে নিজেকে খুঁজে নেওয়া, ফিরে দেখার এক নিরন্তর অভিযানে নিয়োজিত হয়েছে একদল মাঝারি মাপের মানুষ।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অরুণ সেন (২০১০)। 'নির্বাসিত শৈশব, ছিন্নমূল যৌবন'; *আলো ছায়ার যুগলবন্দি* মাহমুদুল হক স্মরণে (সম্পাদনা : আবুল হাসনাত, মফিদুল হক, আবু হেনা মোস্তফা এনাম), সাহিত্য প্রকাশ। ঢাকা।

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১০)। 'দেশত্যাগের *কালো বরফ* : তাৎপর্যবিচার'; *আলো ছায়ার যুগলবন্দি* মাহমুদুল হক স্মরণে (সম্পাদনা : আবুল হাসনাত, মফিদুল হক, আবু হেনা মোস্তফা এনাম), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১৪)। 'মনঃসমীক্ষাবাদী সাহিত্যতত্ত্ব', *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, (সম্পাদনা : বেগম আকতার কামাল), অবসর, ঢাকা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১২)। 'ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস'; *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, (সম্পাদনা : গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়), আনন্দ, কলকাতা।

ফয়েজ আলম (২০১৫)। *অরিয়েন্টালিজম এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ*, ভূমিকা ও ভাষান্তর, সংবেদ, ঢাকা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (২০১১)। 'জীবন আমার বোন : জনান্তিকের মুক্তিযুদ্ধ'; *উষালোকে*, (সম্পাদনা : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ), ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা, নব পর্যায়, ষষ্ঠ সংখ্যা।

মাহমুদুল হক (২০০৯)। *অনুর পাঠশালা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

(২০১০)। *কালো বরফ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

(২০১০ক)। *নিরাপদ তন্দ্রা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

(২০১২)। *জীবন আমার বোন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

রংগন চক্রবর্তী (২০১৪)। 'কলোনিয়ালিজম'; *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, (সম্পাদনা : সুধীর চক্রবর্তী), নবযুগ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা।

শরীফ হারুন অনূদিত (১৯৯৭)। জ্যাঁ-পল সার্ত্রের *অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ*, প্র. প্র. ১৯৮৫, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সুতপা ভট্টাচার্য (২০০৩)। *গাঢ় শঙ্খের খোঁজে*, প্যাপিরাস, কলকাতা।

সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৪)। 'জীবন আমার বোন : এক বিকল্প নন্দন'। *গল্পকথা*, গল্প ও গল্পভাষ্যের কাগজ। বর্ষ ৪ সংখ্যা ৫, ফেব্রুয়ারি।

হায়দার আকবর খান রনো (২০১৪)। 'উত্তর-আধুনিকতাবাদ ও মার্কসবাদ'; *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ধ্রুপদী ও আধুনিক* (সংকলন ও সম্পাদনা : হাবিব রহমান), কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

হিমাদ্রি লাহেড়ি (২০০৯)। 'ঔপনিবেশিকতাবাদ ও উত্তর- ঔপনিবেশিকতাবাদ'; *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*। (সম্পাদনা : নবেন্দু সেন)। রত্নাবলী, কলকাতা।

Sartre, Jean Paul (1984). *Existentialism and Humanism* (translation and Introduction by Philip Mainet). Matheren, London.